

নাম: মো: কালাম

জন্ম তারিখ: ২১ জানুয়ারি, ১৯৬৩

শহীদ হওয়ার তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : চা বিক্রেতা

শাহাদাতের স্থান : আজমল হাসপাতাল, মিরপুর ১০, ঢাকা

শহীদেদের জীবনী

মেয়েকে খুঁজতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় নৃশংসতায়

নিজেই হারিয়ে গেলেন

মোহাম্মদ কালাম, চায়ের কাপে যেন জুলন্ত বিপ্লব

কোনো কোনো নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা হয় না, তা লেখা হয় রক্তে, চোখের জলে, আর নিঃশব্দ প্রতীক্ষার গভীর দীর্ঘশ্বাসে। মোহাম্মদ কালাম ছিলেন এমনই এক নামহীন বীর একজন রাস্তার চা-ওয়ালার, যাঁর গলা দিয়ে বেরোনো ‘চা লাগবে ভাই?’ এই প্রশ্নে জেগে উঠত শহরের ক্লান্ত মানুষ, অফিস ফেরত শ্রমিক, রিকশাওয়ালা, কিংবা বিপ্লব-ভাসা ছাত্র। খুলনার খালিশপুর থেকে উঠে এসে ঢাকার মিরপুর-১০ এলাকায় তাঁর ঠাই, যেখানে তিনি প্রতিদিন সকাল বিকেল রাস্তার কোণায় দাঁড়িয়ে চায়ের কাপ গরম রাখতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে গরম রাখতেন দেশের ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস।

তাঁর বাবা প্রয়াত, মা আবেদা খাতুন আজো গাল ঢাকা ওড়নায় ছেলের গন্ধ খোঁজেন। স্ত্রী মোছা. সিতারা (৫২) যাঁর মুখে আজ কথা নেই, শুধু স্তব্ধতা। তাঁদের সংসার ছিল সরল, সংকুচিত, কিন্তু ভালোবাসায় পূর্ণ। চার কন্যা শারমিন (৩৭), পারভিন (৩৩), ইয়াসমিন (৩০), আর ছোট চাঁদনী (২০) চাঁদনিই ছিলেন বাবার সবচেয়ে উজ্জ্বল স্বপ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কল্পনা নিয়ে চাঁদনির চোখে যেমন আলো ছিল, তেমনি ছিল কালামের চোখে দৃঢ় অহংকার। তিনি বলতেন, “গরিবের মেয়েও ডাক্তার হতে পারে, যদি মন জাগে।”

কিন্তু রাষ্ট্র কখনোই চায় না গরিবের ঘরে স্বপ্ন জন্ম নিক। তারা চায়, স্বপ্ন থাকুক শুধু বিপ্লবীদের ওয়ার্ডরোবের মধ্যে ভাঁজ করে রাখা দামি কোটের পকেটে। চা-ওয়ালার ঘরে উচ্চশিক্ষার গল্প তাদের কাছে বিদ্রোহ মনে হয়। তাই যখন কোটা সংস্কার আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ এসে পড়ে শহরের রাস্তায়, তখন কালাম আর শুধু চা বিক্রেতা ছিলেন না তিনি হয়ে ওঠেন আন্দোলনের অবিচল এক চিহ্ন। তিনি ছাত্রদের পাশে দাঁড়ান, শুধু চা দিয়ে নয়, সাহস দিয়ে। গরম কাপ হাতে তুলে দিয়ে বলতেন, “নাও ভাই, আগুন লাগাও রক্তে।”

৩ আগস্ট ২০২৪ তত্ত্ব দপূর, গোলাগুলির ধোঁয়া চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তখনও কালাম মিরপুরে ছাত্রদের চা দিচ্ছেন। গুলির শব্দে থেমে গিয়েছিল অনেকের বুকের ধুকপুকুনি, কিন্তু তাঁর হাত কাঁপে না। তিনি ছিলেন না নেতা, না কোনো বক্তা কিন্তু তাঁর কর্মই ছিল অগ্নিমন্ত্র। যখন হঠাৎ একটি গুলি ছিন্ন করে দেয় তাঁর বুক, তখন চায়ের কাপ পড়ে যায় ধুলোয়, আর এক অমর প্রতীক জন্ম নেয়।

কালাম আজ আর চা বিক্রি করেন না তিনি বিক্রি করে গেছেন নিজের জীবন, স্বপ্ন, সন্তানদের ভবিষ্যৎ, যেন কোনো এক মহাবিপ্লবের প্রথম কবিতায় নিজের নাম লিখে দিতে পারেন। তাঁর মৃত্যু আমাদের চোখে জল আনে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি আমাদের অন্তরে রক্ত জাগায় কারণ চায়ের কাপ থেকে এই যে আগুন জ্বলে উঠেছে, তা নিভে যাবে না কোনো রাষ্ট্রীয় জল দিয়ে।

মোহাম্মদ কালামের নাম আজো অনেকে জানে না, কিন্তু এই বিপ্লব এই জুলাই রক্তপাতের ভোর তাঁর মতো মানুষেরাই লিখেছেন, যাঁরা বক্তৃতা দিতে জানতেন না, কিন্তু চুপচাপ নিজের জীবন রেখে গেছেন স্বাধীনতার বেদীতে। তাই বলি, শহীদ মোহাম্মদ কালাম শুধু চা-ওয়ালার নন, তিনি ছিলেন আমাদের বিবেকের অগ্নিস্নানে প্রথম গৃহস্থ।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: চাঁদনির বাবার পথচলা এবং রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ জ্বলছিল, শুধু দাবিতে নয় মনের মধ্যে, রক্তে, কথায়, কল্পনায়। এই আগুন কোনো রাজনীতিবিদ জ্বালায়নি, কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি ছাপা হয়নি কাগজে। এই আগুন এসেছিল মানুষের ভেতর থেকে, এক পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর অপ্রাপ্তির আত্মনাদ থেকে, যেখানে স্বপ্নগুলো ছেঁড়া রেজাল্ট কার্ডের মতো উড়ছিল রাস্তায় রাস্তায়। কোটা সংস্কারের দাবিকে কেন্দ্র করে গুরু হলেও, এই আন্দোলনের মর্মে ছিল এক গভীর চেতনাবোধ মানবিকতার, ন্যায়ের, আর রাষ্ট্রবিরোধী প্রতিরোধের। যাঁরা মিছিলে নামছিলেন, তাঁদের হাতে লাঠি ছিল না, কিন্তু শব্দ ছিল আগুনে পোড়া। চোখে জল থাকলেও সেই জলে ছিল প্রতিরোধের প্রতিফলন। সেই সময়, সেই দিনগুলো ছিল যেন এক হিন্নমূল ভবিষ্যতের পুনর্জন্ম। ১৯ জুলাই, শুক্রবার। জুমার নামাজের ঠিক পরে মিরপুর-১০ এলাকা পরিণত হয় এক বিপ্লবী ক্ষেত্রভূমিতে। চারপাশে টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া, ককটেলের বিস্ফোরণ, আগুন আর পুলিশের বুটের শব্দে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। ছাত্ররা তখনো দাঁড়িয়ে ছিল নির্ভীকভাবে। সেই ছাত্রদের ভিড়ে ছিলেন চাঁদনী আক্তার একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখা মেয়ে, শহীদ মোহাম্মদ কালামের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা। বাবা জানতেন মেয়ের ইচ্ছা ডাক্তার হওয়ার, কিন্তু হয়তো তিনি কখনো ভাবেননি যে এই ইচ্ছার জন্য মেয়েকে একদিন রাজপথে দাঁড়াতে হবে।

যখন তাঁর কানে আসে, “চাঁদনী মিছিলে নেমেছে” তখন আর ঘরে বসে থাকতে পারেননি। সেই মুহূর্তে মোহাম্মদ কালাম ছিলেন না আর শুধু একজন চা বিক্রেতা, তিনি

হয়ে ওঠেন এক উদ্দিগ্ন পিতা, এক আশঙ্কায় দক্কন হৃদয়। কোন রাজনীতি, কোন বিপ্লব, কোন কোটার ধারা সে মুহূর্তে তাঁর কাছে সব ছিল গৌণ। তিনি শুধু

জানতেন মেয়ে রাজপথে গেছে, এবং চারদিকে গুলি, গ্যাস, দাহ্য বারুদের গন্ধ।

চায়ের কাপ ফেলে দিয়ে, রাস্তার মোড় পেরিয়ে তিনি ছুটে যান মেয়ের খোঁজে। মানুষের কাঁধে চেপে ওঠা এক সাধারণ অভিভাবক, যার বুকের ভেতর ছিল একটাই প্রশ্ন “চাঁদনী কোথায়?” তিনি কারও বিরুদ্ধে যাননি, কোনো দল কিংবা পতাকা নিয়ে আসেননি, তাঁর হাতে ছিল না কোন অস্ত্র তাঁর হাত খালি, কিন্তু হৃদয় ছিল ভালোবাসায় পূর্ণ। রাষ্ট্র এই ভালোবাসাকেই ভয় পায়। কারণ, রাষ্ট্র জানে, এমন এক পিতা যে নিজের জীবন দিয়ে মেয়েকে খুঁজতে রাজপথে নেমে আসে, সে কোনো রাজনীতির সংজ্ঞায় বাঁধা যায় না।

তাই তারা গুলি চালায়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে, সমাজের শৃঙ্খলার নামে, তারা গুলি ছোঁড়ে একজন পিতার ভালোবাসার দিকে। চা-ওয়ালার বুক গুলি করে তারা ঘোষণা করে দেয় “স্বপ্ন দেখা যাবে না, ভালোবাসা দেখানো যাবে না, প্রতিবাদ করা যাবে না।”

কিন্তু তারা জানে না, সেই গুলির শব্দ একদিন ইতিহাসের পাতা ফেঁড়ে বেরিয়ে আসবে। মোহাম্মদ কালাম পড়ে যান, কিন্তু মাটি তাঁকে ধরে রাখে না চূপচাপ। সেই মাটি আজো কাঁপে চাঁদনীর কান্নায়, ছাত্রদের শপথে, আর জুলাই বিপ্লবের বলকে যেখানে একজন পিতার মৃতদেহ হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার নতুন ব্যাখ্যা। যেভাবে শহীদ হন: রক্তের নিচে চাপা পড়ে থাকা এক অসীম পিতার নাম, মিরপুর-১০ মেট্রোরেল স্টেশন সেদিন ছিল না কোনো যাত্রী, ছিল না কোনো গন্তব্য, শুধু ছিল এক অদৃশ্য মৃত্যুমুখ। গরমে ঘামছিল শহর, কিন্তু রক্তে পুড়ছিল মানুষ। দুপুরে আনুমানিক ২টা জুমার নামাজ শেষ হয়েছে, অথচ শহরের বাতাসে আজান নয়, শোনা যাচ্ছিল টিয়ার গ্যাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ, পুলিশের বুটের ঠকঠক, আর শাসকের ভয় পেয়ে গলা চেপে রাখা মিডিয়ার নীরবতা। চারদিকে এক অদ্ভুত শূন্যতা, যার মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন মোহাম্মদ কালাম একজন চা-ওয়ালার, একজন পিতা, যিনি মেয়ে খুঁজতে এসেছিলেন, অস্থির হয়ে, চোখভর্তি ভয় আর ভালোবাসা নিয়ে।

চাঁদনী আন্দোলনে ছিল পায়ের নিচে ফুটপাথ, কাঁধে জাতীয় পতাকার শাল, চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কিন্তু সে জানত না, ঠিক তার পেছনে হাঁটছেন তার বাবা, কোল থেকে নামিয়ে বড় করা মানুষটি। কালাম ছিলেন না কোনো সংগঠনের প্রতিনিধি, তাঁর নামে ছাপা হয়নি কোনো ব্যানার, কিন্তু তিনি এসেছিলেন ইতিহাসের গভীরতম হৃদয়ভূমি থেকে এক পিতার উদ্বিগ্ন ভালবাসা থেকে।

হঠাৎ করেই শুরু হয় গোলাগুলি। স্লোগানের মধ্যাহ্ন হানা দেয় শাসনের গর্জন। মিছিলে ছিল হাজারো স্বর, কিন্তু গুলি চিনে নেয় কাকে থামাতে হবে। কালাম তাকিয়েছিলেন মেয়ের দিকে, কিন্তু মেয়ের চোখ তাঁর ছিল না তখনো চাঁদনী জানত না, তাঁর পিতা তাঁর পেছনে আছেন।

প্রথম গুলি আঘাত হানে তাঁর বাম হাতে, দ্বিতীয়টি একই হাতে, আর তৃতীয় গুলি তাঁর বুক বিদ্ধ করে। কফিন তৈরি হয় চোখের পলকে এক কাপ চা বিক্রেতার শরীরে, যে মানুষদের জাগিয়ে রাখতেন প্রতিদিন সকালে, এখন নিজেই ঢলে পড়লেন চিরনিদ্রায়। মৃত্যু হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই না কোনো অ্যান্ডুলেন্স, না কেউ ছুটে আসা, শুধু ধুলোমাখা রাস্তায় পড়ে থাকা একটি নিখর দেহ, যার শরীরে তখনও গরম রক্ত টসটস করে গড়িয়ে পড়ছিল।

চাঁদনী তখনো জানত না তার পিতার গা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে জীবন। সন্ধ্যায় যখন পরিবার খুঁজতে শুরু করে, তখন জানতে পারে লাশ পড়ে আছে আজমল হাসপাতালে। কিন্তু তখন শহর জুড়ে কারফিউ, কেউ বের হতে পারছে না, হাসপাতালও রাজি নয় লাশ রাখতে মৃতদেহের উপরও যেন শাসকের ঘণা। রাষ্ট্র তখন চোখ বন্ধ করে, যেন এমন কিছু ঘটেনি।

একজন চা বিক্রেতা, যিনি প্রতিদিন মানুষকে জাগিয়ে রাখতেন গরম চায়ের কাপে, তাঁরই লাশ রাখা যায় না জীবনের কোনো কোণে। তাঁর মৃত্যু নেই কোনো খবরে, নেই কোনো ব্যানারে, নেই প্রেসক্লাবে মোমবাতির মিছিল। কিন্তু তাঁর রক্ত লেগে আছে আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিটি দেওয়ালে যেখানে কোনো মা সন্তান হারায়, কোনো মেয়ে বাবার পায়ের আওয়াজ শুনে আর দরজা খোলে না।

মোহাম্মদ কালাম ছিলেন ‘নামহীন’ শহীদ, কিন্তু ইতিহাস তাঁর নাম জানে। এই মৃত্যুই আমাদের দায়মুক্তি হীন নিঃশ্বাসের নিচে লুকিয়ে থাকা স্কোভের আগুন। তাঁর রক্তের দাগ এখনো মিরপুর-১০ এর ইন্টার মাঝে, এবং প্রতিবার যখন কেউ বলে, “আমার বাবাও একদিন ছিল,” তখনই সেই রক্ত আবার জেগে ওঠে। এই মৃত্যু কোনো ‘নিউজ ফ্ল্যাশ’ নয়, এটি এক জাতির স্থায়ী ব্যর্থতা।

পরিবারের বাস্তবতা ও অনুতাপের আখ্যান: এক নিঃশব্দ কান্নার দীর্ঘ প্রতিধ্বনি সিতারা বেগম একটি নাম, যা আজ দাঁড়িয়ে আছে শূন্যতার পাহাড় ঘেঁষে। এক সময় যিনি ছিলেন স্বামী-সন্তান নিয়ে ঘরের অন্দরমহলের গৃহিণী, এখন তিনিই এই পরিবারের মাথা, রুটি-রুজির শেষ ভরসা যদিও হাতে নেই কোনো উপায়, কাঁধে নেই কোনো শক্তি, আর চোখে নেই সেই পুরোনো আলো। মোহাম্মদ কালামের মৃত্যু শুধু একজন স্বামীকে হারানো নয়, বরং একটি পুরো আকাশ ভেঙে পড়ার গল্প। এখন চার মেয়ের মধ্যে তিনজনের বিয়ে হয়েছে, তারা নিজের সংসারে ব্যস্ত, আর যিনি রয়ে গেছেন সে চাঁদনী, সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে প্রিয়, বাবার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন আজ তিনিই লড়ছেন প্রতিটি নিঃশ্বাস ধরে রাখতে।

চাঁদনী এখনো বাবার ব্যবহৃত পুরোনো চায়ের কেটলিটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে। প্রতিদিন সকালে সেই কেটলির পাশে বসে, চোখে পানি নিয়ে বলে ওঠে, “আব্বু, তুমি আজ থাকলে কী হতো?” কখনো উত্তর আসে না কেবল দেয়ালের ফটলে জমে থাকা রোদ আর এক টুকরো নির্জনতা তাকে জবাব দেয়। তার মনে হয়, বাবা তার জন্যই মরেছেন। সে ভাবে, “আমি না গেলে, তিনি তো আসতেন না” এই অপরাধবোধ, এই না-পারার কষ্ট প্রতিদিন তাকে গিলে খায়, নিঃশব্দে। অথচ বাস্তবতা জানে, কালাম কোনো নেতা ছিলেন না, কোনো রাজনৈতিক চালচলিও আবদ্ধ যোদ্ধা নন। তিনি ছিলেন একজন বাবা ভালোবাসার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত একজন নিরীহ পিতা।

আজ এই পরিবারে নেই কোনো আয়ের পথ, নেই সহায়তার কেউ, নেই ভবিষ্যতের কোনো প্রতিশ্রুতি। কেবল আছে স্মৃতি, আছে অভাব, আর আছে রাষ্ট্রের দ্রুতগতিবাহী অবজ্ঞা। চাঁদনীর চোখে যে আলো ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার, আজ তা নিভু নিভু প্রদীপ। একটু হাওয়ায় যেন নেভে যেতে পারে। অথচ এই পরিবার কিছু চায় না না অর্থ, না করুণা, না মিডিয়ার ফুটেজ। তারা শুধু চায়, বাবার মৃত্যু যেন অর্থহীন না হয়।

চাঁদনী আজও কোনো প্রগতিশীল বক্তৃতা দেয় না, দেয় না কোনো রাজনৈতিক স্লোগান। সে শুধু চায়, কেউ যেন তার পড়ালেখার দায়িত্ব নেয়। কেউ যেন বলে, “তোমার বাবার মৃত্যু ছিল এই রাষ্ট্রের বিবেকের জাগরণ।” কিন্তু রাষ্ট্র তো ঘুমিয়ে আছে, এতটাই গভীর ঘুম যে একজন শহীদে পরিবারের আর্তনাদও তার কানে পৌঁছায় না।

কালাম কখনো কিছু দাবি করেননি। তিনি শুধু দিয়েছেন চা, হাসি, ভালোবাসা। আর একদিন সেই ভালোবাসার খাতিরেই তিনি দিয়ে দিলেন নিজের প্রাণ। এখন এই পরিবার শুধু চায়, যেন সেই মৃত্যু একটি মেয়ে মানুষের জীবনের নিশ্চয়তা হয়ে দাঁড়ায়। যেন একজন বাবার ভালোবাসা রাষ্ট্রের নির্লজ্জ চুপিকে ভেদ করে আলো হয়ে জ্বলে ওঠে।

এখন চাঁদনির দিন কাটে বাবার ছবির পাশে বসে, রাত কাটে স্বপ্নে বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে। সিতারা বেগম প্রতিদিন অপেক্ষা করেন কোনো সংবাদ, কোনো মানুষ, কোনো আলো আসবে বুঝি। কিন্তু কেউ আসে না। একা একা ঘরটায় জমে ওঠে ব্যথা, যা রাষ্ট্রের অজুহাত দিয়ে মোছা যায় না। এই একাকীত্বই হলো এই পরিবারের একমাত্র অবশিষ্টতা এবং এই নিঃসঙ্গতা আমাদের জাতিগত অপরাধের জীবন্ত সাক্ষী।

মোহাম্মদ কালাম যিনি কোনো রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন না, ছিলেন এক পিতা, এক প্রেমিক, এক চা বিক্রেতা। তাঁর মৃত্যু আজ একটি জাতিকে জাগিয়ে তোলার ডাক হয়ে বেঁচে থাকবে, যতদিন কেউ "আব্বু" বলে দরজা খুলে দাঁড়াবে আর ভেতরে কেউ থাকবে না।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

শহীদের পূর্ণনাম : মো: কালাম

পেশা : চা বিক্রেতা

জন্ম : ২১ জানুয়ারি ১৯৬৩

পিতা : মৃত খলিল

মাতা : মৃত আবেদা খাতুন

স্ত্রীর : মোছা. সিতারা (বয়স ৫২, পেশা গৃহিণী)

সন্তান : চার মেয়ে-শারমিন আকতার (৩৭, গৃহিণী), পারভিন খাতুন (৩৩, গৃহিণী), ইয়াসমিন (৩০, গৃহিণী)

চাঁদনী আক্তার (২০, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিচ্ছু)

স্থায়ী ঠিকানা : বাউপাড়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী, রংপুর (যাতায়াত সীমিত)

বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: পোস্ট অফিস গলি, বৈঠাখালি, মধ্য বাড্ডা, উপজেলা: বাড্ডা, জেলা: ঢাকা (শাহাদাতের পূর্বে) এ/৪৯, রোড-১৭,

ওয়ার্ড- ১০, খালিসপুর, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা (শহীদ পরিবারের বর্তমান অবস্থান)

ঘটনার স্থান : মিরপুর-১০, ঢাকা

আঘাতকারী : পুলিশ

আঘাতের সময় : স্পট ডেথ (ঘটনাস্থলেই মৃত্যু)

মৃত্যুর তারিখ ও সময় : ১৯ জুলাই ২০২৪, দুপুর ২টা

মৃত্যু পরবর্তী স্থান : আজমল হাসপাতাল, মিরপুর-১০

কবরের বর্তমান অবস্থান : জান্নাতুল মাওয়া কবরস্থান, মিরপুর-১০

পরিবারটির সহযোগিতা প্রসঙ্গে

প্রথমত, ছোট মেয়ে চাঁদনী আক্তারের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ

দ্বিতীয়ত, সিতারা বেগমের জন্য স্থায়ী বাসস্থান ও মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা